بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ মে, ২০২৫ মোতাবেক ১৬ হিজরত, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আমি আজও মহানবী (সা.) পরিচালিত সারিয়া বা সেনাভিযান সম্পর্কে আলোচনা করব। আমার কাছে যেসব নোট রয়েছে, তাতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে এই অভিযানগুলোরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে। এরপর আমি অন্য বিষয় আলোচনা করব।

আবু কাতাদা আনসারীর অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা খাযেরা অভিমুখে ছিল। এই অভিযান অষ্টম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবু কাতাদা। খাযেরা মদীনা মুনওয়ারার উত্তর-পূর্বে বনু মুহারিবের অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এটিকে তিহামা অঞ্চলও বিবেচনা করা হতো, যা নজদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বনু গাতাফানের একটি শাখা বসবাস করত। বনু গাতাফান ইসলামের বিরোধিতায় নিরন্তর লিপ্ত ছিল এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করত না। নজদ অঞ্চলের খাযেরায় বসবাসকারী বনু গাতাফান মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনিষ্ট ছড়াতে ব্যস্ত ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি হাদরাদ আসলামী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি হযরত সুরাকা বিন হারেসার মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে আমি যা কিছুই অর্জন করেছি, সেসব জিনিসপত্রের মধ্যে আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমার কাছে এই মর্যাদার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। আমি তার মোহরানা দুইশ দিরহাম নির্ধারণ করেছিলাম, কিন্তু আমার কাছে তাকে দেবার মতো কিছুই ছিল না। আমি বললাম, এই মোহরানা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই পরিশোধ করাবেন। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই এবং তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বলি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি মোহরানা কত নির্ধারণ করেছ? আমি বললাম, দুইশ দিরহাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)। আমাকে তার মোহরানা পরিশোধে সাহায্য করুন। তিনি (সা.) বলেন, এখন আমার কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু আমি আবু কাতাদাকে কিছু লোকের সাথে একটি সেনা অভিযানে পাঠানোর ইচ্ছা রাখি। তুমি কি এতে যেতে চাও? আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তোমার স্ত্রীর মোহরানা গনিমত হিসেবে দান করবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। তারপর আমরা রওয়ানা হই। আমরা মোট ষোলোজন ছিলাম। হযরত আবু কাতাদা আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি (সা.) আমাদেরকে নজদের অভিমুখে বনু গাতাফান গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তিনি (সা.) নির্দেশ দেন, তোমরা রাতে যাত্রা অব্যাহত রাখবে ও দিনে লুকিয়ে থাকবে এবং আকস্মিক আক্রমণ করবে আর নারী ও শিশুদের হত্যা করবে না। তারপর আমরা বের হই এবং গাতাফানের (বসতির) একদিকে পৌঁছে যাই। যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন আবু কাতাদা আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং আল্লাহ্কে ভয় করার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি দুইজন দুইজন করে জোড়া বানিয়ে দেন এবং বলেন, প্রত্যেকে যেন তার সঙ্গী থেকে পৃথক না হয়, যতক্ষণ না সে শহীদ হয় অথবা আমাকে তার খবর দেয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি

যেন আমার কাছে এমন অবস্থায় না আসে, যাকে তার সাথি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, আমি দ্বিতীয়জন সম্পর্কে জানি না; অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে। আর যখন আমি তকবীর বলব তখন তোমরাও তকবীর বলবে, এবং যখন আমি আক্রমণ করব তখন তোমরাও আক্রমণ করবে। আর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে বেশি দূরে যাবে না। অর্থাৎ বেশি পিছু ধাওয়া করবে না; যদি শত্রু পালিয়ে যায় তবে তাকে যেতে দেবে। অতএব আমরা সেখানে উপস্থিত লোকদের ঘিরে ফেললাম। হযরত আবু কাতাদা খাপ থেকে নিজের তরবারি বের করেন এবং তকবীর দেন, আমরাও আমাদের তরবারি খাপ থেকে বের করে তার সাথে তকবীর দেই। এরপর আমরা সেখানে উপস্থিত লোকদের ওপর আক্রমণ করি। হঠাৎ আমি দেখি, তাদের মধ্য হতে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি খোলা তরবারি নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে এবং বলছে, হে মুসলমানরা! জান্নাতের দিকে এসো। আমি তার পিছু নেই। সে কাফির ছিল এবং বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে বলছিল, তোমরা জান্নাত চাও তো? তাহলে এসো জান্নাতের দিকে! সে **'জান্নাত, জান্নাত'** বলে আমাদের ঠাট্টা করছিল। আমি বুঝতে পারলাম, সে ফিরে আসবে। আমি তার পেছনে যাই। আমার সঙ্গী বলল, দূরে যেও না, আমাদের নেতা আমাদেরকে পিছু ধাওয়া করতে নিষেধ করেছেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি তাকে ধরে ফেলি এবং তার নগ্ন পিঠের দিকে তির নিক্ষেপ করি। সে পুনরায় বলে, হে মুসলমানরা! তোমরা জান্নাতের নিকটবর্তী হও। পুনরায় বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে একথা বলে। আমি তাকে লক্ষ্য করে আরেকটি তির নিক্ষেপ করি এবং তাকে হত্যা করি। এরপর আমি তার তরবারি নিয়ে নেই। আমার বন্ধু আমাকে ডেকে বলছিল, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আবু কাতাদার কাছে গিয়েছিলাম; তিনি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং আমি তাকে বলে দিয়েছি। আমি বললাম, আমীর কি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ, এবং তিনি আমার ও তোমার ওপর রাগ করছিলেন। সে বলল, তিনি আমাকে জানান যে, মুসলমানরা গনিমতের সম্পদ সংগ্রহ করেছে এবং তাদের নেতাদের হত্যা করেছে। অতএব আমি হযরত আবু কাতাদার কাছে যাই, তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করেন। আমি বললাম, আমি একজন লোককে হত্যা করেছি যার অবস্থা এমন ছিল এবং সে এই এই কথা বলছিল। তারপর আমরা পশুদের হাঁকাই এবং মহিলাদের বন্দি করি। আমাদের তরবারিগুলো পালান বা হাওদার সাথে ঝোলানো ছিল। সকাল হলে আমার উট থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল। একজন মহিলা, যে হরিণের মতো বারবার পিছনে তাকাচ্ছিল এবং কাঁদছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখছ? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি একজন ব্যক্তিকে খুঁজছি। যদি সে জীবিত থাকত, তাহলে আমাদেরকে তোমাদের হাত থেকে রক্ষা করত। আমার মনে হলো, সে সম্ভবত সেই লোকটাই যাকে আমি হত্যা করেছি এবং তারই তরবারিটি হাওদার সাথে ঝুলছে। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, এটা তার তরবারির খাপ। তার কাছে সেই ব্যক্তির তরবারির খাপ ছিল। এটাতে (তরবারি) ঢুকিয়ে দেখো, যদি তুমি সত্য বলে থাক। আমি (তাতে তরবারি) ঢুকালে এটি পুরোপুরি ঢুকে যায়। তারপর সেই মহিলা কাঁদতে থাকে। এরপর আমরা মহানবী (সা.)-এর সেবায় উট এবং ছাগল নিয়ে আসি। এক বর্ণনা অনুযায়ী, সাহাবীরা এই অভিযানে পনেরো রাত বাইরে ছিলেন এবং দুইশ উট, এক হাজার ছাগল এবং অনেক বন্দি নিয়ে এসেছিলেন। তা থেকে খুমুস (অর্থাৎ পঞ্চমাংশ) আলাদা করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকের ভাগে বারোটি উট এসেছিল। একটি উটকে দশটি ছাগলের সমান ধরা হয়েছিল। অপর এক রওয়ায়েত অনুযায়ী, এই অভিযানে দুইশ উট, দুই হাজার ছাগল এবং বহু বন্দি গনিমত হিসেবে লাভ হয়েছিল।

অপর একটি সেনাভিযান আবু কাতাদার নেতৃত্বে ইযাম উপত্যকা অভিমুখে পরিচালিত হয়েছে। এটি ৮ম হিজরীর রমযান মোতাবেক জানুয়ারি ৬৩০ সালে সংঘটিত হয়েছিল। ইযাম মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে পূর্ব দিকে নজদ অঞ্চলে একটি উপত্যকা, যেখানে গাতাফান গোত্রের একটি শাখা বনী আশজাআ বসবাস করত। এই অভিযানের কারণ হলো, যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কা অভিমুখে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি (সা.) হযরত আবু কাতাদাকে ইযাম উপত্যকার দিকে প্রেরণ করেন যা মদীনা থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত, অথচ মক্কা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত; যেন লোকেরা মনে করে, মহানবী (সা.) মক্কার দিকে নয় বরং ইযামের দিকে যাচ্ছেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি হাদরাদ। হযরত আবু কাতাদার সাথে আটজন সাহাবী ছিলেন যাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মুহাইলেম বিন জাসামা লাইসী। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি হাদরাদ বর্ণনা করেন, যখন আমরা ইযাম উপত্যকায় পৌঁছি, তখন সেখানে আমের বিন আযবাত আশজাই আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি তাদের কাছে এসে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদেরকে সালাম দেয়। এতে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে হাত তোলা থেকে বিরত থাকে, কারণ সে ইসলামী পদ্ধতিতে সালাম দিয়েছিল, তাই ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তারা (আক্রমণ থেকে) বিরত থাকে। কিন্তু হযরত মুহাইলেমের এই ব্যক্তির সাথে অতীতের কোনো বিবাদ ছিল, তাই তিনি আমের বিন আযবাতের ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলেন এবং তার সামগ্রী ও উট নিজের দখলে নিয়ে নেন। এছাড়া অন্য কোনো দলের সাথে সাহাবীদের সংঘর্ষ হয় নি। যেহেতু তাদের শুধু মুশরিকদের মনোযোগ ভিন্ন দিকে সরানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল, তাই সাহাবীরা সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরই মাঝে তারা জানতে পারেন, মহানবী (সা.) মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন, তাই তারাও সেই দিকে ঘুরে যান আর পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। যখন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন, তখন তারা উক্ত হত্যার সমস্ত ঘটনা তাঁকে (সা.) অবগত করেন। ইতিহাসের বইয়ে লেখা আছে, (তখন) এই আয়াত অবতীর্ণ হয়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (সূরা নিসা: ৯৫)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর করো, তখন ভালোভাবে তদন্ত করে নাও। আর যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে এ কথা বলো না যে, তুমি মুমিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ চাও। আল্লাহ্‌র কাছে তো প্রচুর গনিমত রয়েছে। এর আগে তোমরাও এমনই ছিলে। তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, তোমরা ভালোভাবে তদন্ত করে নাও। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ এতে নিষেধ করে বলা হয়েছে, যে সালাম করে তার সাথে কোনো বিবাদ করবে না, তার সাথে কোনো কঠোরতা করবে না, তাকে হত্যা করবে না বা শাস্তি দেবে না।

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এই অভিযান হিজরী ৮ম বছরে হয়েছিল, কিন্তু এই আয়াতটি হলো সূরা নিসার এবং এই রেওয়ায়েতটি সীরাত ইবনে কাসীরে লেখা আছে। আর সূরা নিসা সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকের মতৈক্য হলো, এটি হিজরতের তৃতীয় থেকে পঞ্চম বছরের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। এটা হতে পারে, এই ঘটনা জানার পর মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠ

করে অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকবেন। যাহোক, এই বিষয়ে তিনি তাদেরকে এই আয়াতের বরাতে সতর্ক করেন। এরপর আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ আশা করি মক্কা বিজয়ের আলোচনা শুরু হবে।

এখন আমি জামাতের একজন প্রবীণ ও পুণ্যবান আর বিশিষ্ট আলেম, খিলাফতের প্রতি নিবেদিত, ইসলামের অতুলনীয় খাদেমের কথা উল্লেখ করব, যিনি সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। একইভাবে আরেকজন নিবেদিত প্রাণ, নিষ্ঠাবান আহমদী যিনি এই দিনগুলোতে কারাবন্দি ছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং যে–সব সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে তা থেকে জানা যায়, এই দিক থেকে তার শাহাদাতের মর্যাদা রয়েছে। যাহোক, প্রথম উল্লেখ হচ্ছে মুকাররম সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেবের, যিনি হযরত সৈয়দ মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)-র পুত্র ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি হযরত আম্মাজান হযরত নুসরাত জাহান বেগম সাহেবার ভাতিজা ছিলেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ও হযরত মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবার জামাতা। তার মায়ের নাম ছিল সালেহা বেগম। তিনি হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের পৌত্র ছিলেন; তার মায়ের নামও সালেহা ছিল, যিনি হযরত পীর মনজুর মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন, যিনি হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব লুধিয়ানভির পুত্র ছিলেন। সৈয়দ মাহমুদ আহমদ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ান থেকে লাভ করেন, তারপর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ করেন। ১৯৪৪ সালের মার্চে তার পিতা হযরত সৈয়দ মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের মৃত্যুর দিন তিনি জীবন ওয়াকফ (উৎসর্গ) করেন। তার পুত্র স্নেহের মুহাম্মদ আহমদও আমাকে লিখেছেন, তিনি ১৭ মার্চ দিনটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন বলে অভিহিত করতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই দিনটি আপনার কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ? তিনি বলেছিলেন, এই দিনে আমার পিতার মৃত্যু হয়েছিল এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সেই দিনটি সারাদিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়েছিলেন, এমনকি নামাযও সেখানেই পড়িয়েছিলেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও দিয়েছিলেন, যাতে তিনি (রা.) মীর (মুহাম্মদ ইসহাক) সাহেবের ধর্মসেবা, ওয়াকফের প্রেরণা এবং জ্ঞান প্রভৃতির উল্লেখ করেন। মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব বলেন, আমি বক্তব্য শুনে দণ্ডায়মান হই এবং সেখানেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে বলি, হুযূর, আমি ওয়াকফ করছি। তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি (রা.) এটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখন সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের বয়স ছিল ১৪ বছর আর এরপর তিনি এই অঙ্গীকার এমনভাবে পালন করেছেন যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার।

তার জামাতের সেবার বৃত্তান্ত হলো, ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে ছিলেন এবং মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করেছেন আর এ-সময়ে তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে SOAS তথা School of Oriental and African Studies -এ শিক্ষার্জন করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সাথে একত্রে পড়াশোনা করেছেন। কিছু দিন (তিনি) লন্ডন মিশনে সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ‘ওয়াকালতে দিওয়ান’-এ রিসার্ভ মুবাল্লিগ হিসেবে ছিলেন। এরপর ১৯৬০ সালে জামেয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় মুবাল্লিগ ছিলেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত স্পেনে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত 'উকিলুত তাসনীফ' হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৮৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে সেবা করেছেন। এই সময়ে ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সালের জুলাই (মাস) পর্যন্ত 'উকিলুত তালীম'ও ছিলেন। একইভাবে রিসার্চ সেল (তথা গবেষণা বিভাগের) প্রধান ছিলেন, ক্রুশীয় ঘটনা (সংক্রান্ত) বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। ২০০৫ সালে নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হলে তিনি এর প্রধান নিযুক্ত হন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে ৩রা জুন ১৯৬২ সালে মজলিসে ইফতার মেম্বার নিযুক্ত করেন আর ১৯৭২ সালের নভেম্বর (মাস) পর্যন্ত তিনি এর মেম্বার ছিলেন। এরপর ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে পুনরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে ইফতার মেম্বার নিযুক্ত করেন এবং আজীবন তিনি এপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়াতেও তিনি বিভিন্ন পদে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন, মোহতামিম ও নায়েব সদর হিসেবেও (সেবা করেছেন)। জ্ঞানের জগতেও তার ব্যাপক সেবা রয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র কুরআনের অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও যার উল্লেখ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রাবওয়ার সাহায্যকারীদের মাঝে যাদের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে সুফী বাশারাতুর রহমান সাহেব, মওলানা আবুল মুনীর নূরুল হক সাহেব, সৈয়্যদ আবদুল হাই সাহেব, মওলানা দোস্ত মুহাম্মদ সাহেব, জামীলুর রহমান রফিক সাহেব প্রমুখ সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। এবিষয়ে তিনি (রাহে.) এটিও বলেছেন, মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবও এদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর আল্লাহ্‌র কৃপায় তারা নিয়মিত আমার সাথে কাজ করেছেন, আর তিনি (রাহে.) তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

সিহাহ সিত্তাহ (হাদীসের) সম্পূর্ণ উর্দু অনুবাদ করার পর (তিনি) মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেরও অনুবাদ করছিলেন। একইভাবে সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যার কাজও চলমান ছিল। তিনি শামায়েল তিরমিযীর অনুবাদও করেছেন। বাইবেল সম্পর্কে অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-সন্দর্ভ লিখেছেন যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ও ইঞ্জিলের তিনটি পুস্তকের ব্যাখ্যা লিখেছেন। একইভাবে মসীহ্‌র কাফন, ঈসায়ী মলম, হযরত ঈসা (আ.)-এর হিজরত সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত মানের গবেষণামূলক কাজ করেছেন। তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তকাদি ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে; সেগুলো হলো– **'সীরাতুন্ নবী (সা.): কানা খুলুকুহুল কুরআন'**-এর তিন খণ্ড। আরেকটি হলো **'হামারে পেয়ারে নবী (সা.) কি পেয়ারী বাতেঁ';** একইভাবে '**তিনশ পঁয়ষট্টি দিন**' নামে ছোট্টো একটি পুস্তিকা রয়েছে, নামাযের পরে প্রত্যেক দিন দরস প্রদানের জন্য। আরেকটি হলো, **'ফিলিস্তিন হতে কাশ্মীর'**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলির আলোকে **'সীরাতুন্ নবী'** সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যউপাত্ত সংকলন করেছেন, এটি এখনো অপ্রকাশিত। সহীহ্ বুখারী থেকে বিভিন্ন তরবিয়তী বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। অনুরূপভাবে প্রাক্তন পোপ যখন আপত্তি উত্থাপন করেছিল তিনি তারও খণ্ডন করেছেন। স্পেনের মসজিদে বাশারাতের ভিত্তি রাখার সময় যে ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) দোয়া করেছিলেন, সেই পাথরও হযরত মোহতরম মীর সাহেব বহন করেছিলেন। অনুরূপভাবে স্পেনের মসজিদে বাশারাত উদ্‌বোধনের সময় তার ও তার স্ত্রীর সেবা করার সুযোগ হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর বক্তব্যে এর উল্লেখও করেছিলেন।

১৯৫৫ সালের সালানা জলসার উদ্‌বোধনী অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আটটি বিয়ের এলান করেছিলেন; এর মধ্যে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের বিয়েও ছিল, যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিজের কন্যা আমাতুল মতীন সাহেবার সাথে পড়িয়েছিলেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বিয়ের এলানের সময় বলেন, সাধারণত **২৯**শে ডিসেম্বর বিয়ের এলান হয়ে থাকে। কিন্তু এই বিয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথমত, একটি বিয়ে আমার নিজের মেয়ে আমাতুল মতীনের, যা মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের পুত্র সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদের সাথে ধার্য হয়েছে। এরপর বিস্তারিত উল্লেখ করেন, যার মাঝে এটিও উল্লেখ করেন যে, মাহমুদ আহমদ বর্তমানে লন্ডনে বি.এ পড়ছে। আল্লাহ্ তা'লা চাইলে আগামী বছর মে মাসে সে ফিরে আসবে। তিনি তার তিনজন সন্তানের উল্লেখ করে বলেন, আমি আমার তিন সন্তানকে তথা জামাতা মীর মাহমুদ আহমদ, (আরেক) জামাতা মীর দাউদ আহমদ এবং তাহের আহমদকে– যে প্রয়াত উম্মে তাহেরের পুত্র, তাদেরকে সেখানে রেখে এসেছি; [এভাবে হুযূর (রা.) মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব, সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ সাহেব ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র নাম উল্লেখ করেন;] যেন তারা শিক্ষার্জন করে এবং ভবিষ্যতে জামা'তের সেবা করতে পারে। তাদেরকে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করে। এরপর তিনি (রা.) বলেন, ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারলে, তারা তিনজনই যেহেতু মৌলভী ফাযেল আর আরবী শিক্ষাও তাদের অতি উন্নত মানের, যদি ইংরেজীও ভালভাবে শিখে নেয় তাহলে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং হযরত সাহেবের পুস্তকাদি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে জামা'তের প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হতে পারবে। তিনি (রা.) আরো বলেন, বর্তমানে **'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'** পত্রিকারও একজন উত্তম ও যোগ্য সম্পাদক দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমি আমার সন্তানদের সেখানে রেখে এসেছি। যদিও এই অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার মাঝে তিন সন্তানের, অর্থাৎ দুই জামাতা ও এক সন্তানের এত ব্যয়ভার বহন করা খুবই কঠিন বিষয়, তবুও আমি মনে করি, জামা'তের সমস্যা আমার সমস্যার চেয়ে বড়ো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র সর্বদা এটি খেয়াল থাকতো যে, জামা'তের খাতিরে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তাই তিনি সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছেন; নিজের সম্পদ, সময় এবং সন্তানদের ওয়াকফ করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) **১৯৮২** সালে যখন মরহুমের সবচেয়ে বড়ো ছেলের বিয়ে পড়ান, তখন হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সন্তানদের প্রসঙ্গে সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের উল্লেখ করেন। তিনি (রাহে.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দোয়া গ্রহণ করেছেন এবং নিজের প্রতি তার অর্থাৎ হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের ভালোবাসা দেখে আল্লাহ্ তা'লা তার তিন সন্তানকে ওয়াকফ করার তৌফিক দান করেন। তিনজনের প্রকৃতিই পরস্পরের চেয়ে ভিন্ন, যেভাবে প্রত্যেক মানুষই পরস্পরের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, কিন্তু একটি বিষয়ে যতটুকু আমি লক্ষ্য করেছি, তিনজনের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য অভিন্ন; অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহ্ দিয়েছেন, যতটুকু দিয়েছেন– তাতে মানুষের শুধু সন্তুষ্ট থাকাই নয়, বরং আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিনি (রাহে.) বলেন, সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেব নিজের স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য তার মধ্যেও ছিল। মীর মাসউদ আহমদ, বর্তমানে অনেক দিন ধরে ডেনমার্কে তবলীগের দায়িত্ব পালন করছেন। তার স্বতন্ত্র স্বভাব রয়েছে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি তার মধ্যেও রয়েছে। আর তার ছোটো ভাই মীর মাহমুদ আহমদ, যার

সন্তানের বিয়ের এলান আমি করব, তিনিও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ওয়াকেফে যিন্দেগী; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি তাদের সবার মধ্যেই রয়েছে– অর্থাৎ জামা'ত যা দেয় তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা এবং কোনো প্রকার দাবিদাওয়া না করা। তিনি (রাহে.) বলেন, তাদের পিতার এই বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে পুরো বংশই পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মামুজান (রা.)-র সন্তানদের অর্থাৎ মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সন্তানদের প্রতি অপার অনুগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে জামা'তের সামনে তাদের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জামা'তের সামনে তারা যেভাবে সর্বাবস্থায় হাসিমুখে ও প্রফুল্লবদনে থেকেছে, তেমনিভাবে তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে করতে নিজেদের জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করে থাকে। তারপর তিনি দোয়া করেন, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন এসব গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

তিনি কবিতা লেখার বিষয়েও অনুরাগী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আই.)-এর কবিতা এবং কালামে মাহমুদের কবিতা তো মুখস্থ ছিলই, এছাড়া তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন। একবার তিনি মুরব্বীদের, যারা জামেয়ায় ভর্তি হতে চায় কিন্তু এখনো জামেয়ায় আসে নি, তবে মুরব্বী হওয়ার বাসনা রাখে– তাদের একটি উপদেশ এবং কর্মপন্থা দিয়েছিলেন। এটি একটি চমৎকার কর্মপন্থা, যা মুরব্বীদের দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, যে জামেয়ায় আসতে চায় এবং যারা এসে গেছে, তাদেরও।

প্রথম বিষয় তিনি লিখেছেন, প্রতিদিন ভোর তিনটায় উঠে ওযূ করে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করুন, (পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী এটিই তাহাজ্জুদের সময়)। প্রতিদিন পাঁচবেলার নামায মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত আদায় করুন; আর রাবওয়াতে বসবাসকারীদের উপদেশ দিয়েছেন, কমপক্ষে একবেলার নামায মসজিদে মোবারকে গিয়ে আদায় করুন। এরপর প্রতিদিন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা লাভের জন্য, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালোবাসার জন্য ও খিলাফতের ভালোবাসার জন্য দোয়া করুন। পঞ্চম বিষয় হলো, তসবীহ্, দরূদ শরীফ, ইস্তেগফারকে নিজের (দৈনন্দিন) অভ্যাসে পরিণত করুন। ষষ্ঠ বিষয় হলো, হযরত সাহেব তথা যুগ-খলীফার সমীপে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রেরণা নিয়ে দোয়ার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখুন। সপ্তম বিষয় হলো, নিজের বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য উত্তমরূপে পালন করুন। অষ্টম বিষয় হলো, নিজের পিতামাতার সেবা করুন এবং যদি তারা দূরে থাকেন তবে তাদের দোয়ায় স্মরণ রাখুন। নবম বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ ও ভাবার্থ শেখার চেষ্টা করুন। দশম বিষয় হলো, রূহানী খাযায়েন কমপক্ষে তিনবার করে অধ্যয়ন করুন। এগারোতম বিষয় হলো, প্রতিদিন আল-ফযল এবং একটি সাধারণ সংবাদপত্র পাঠ করুন। প্রতিদিন কমপক্ষে একটি মানবসেবামূলক কাজ অবশ্যই করুন।

তার ছেলে সৈয়্যদ গোলাম আহমদ ফার্‌রুখ তার সম্পর্কে লিখেছেন; আমি তার কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্‌র প্রতি আব্বাজানের যে ভালোবাসা ছিল, নামাযে ও যিকরে এলাহী তথা আল্লাহ্‌র স্মরণে তা প্রকাশ পেতো। (হুযূর বলেন,) আমিও মসজিদে তার নামায পড়া দেখেছি। এক কোণে দাঁড়িয়ে পরম বিনয় ও কাকুতিমিনতির সাথে তিনি নামায পড়তেন। বাড়িতে যেসব নামায তিনি পড়তেন সেগুলোর অবস্থাও এমনটিই হয়ে থাকবে; তা তো আমরা দেখি নি, তবে বাইরেও নামাযের সময় তার এক অদ্ভুত অবস্থা হতো। এমন এক স্বভাবসুলভ ও অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল, তিনি মানুষের সামনে তা প্রকাশ করতে চাইতেন না; কিন্তু তবুও কখনো কখনো প্রকাশ পেয়ে যেত, মানুষজন নিজ থেকেই

লক্ষ করত। উদাহরণস্বরূপ, তিনি লিখেছেন, আমি আব্বার নোটবুক ঘাঁটলে তাতে প্রতিদিন 'আল্লাহ্' শব্দটি লেখা দেখতে পাই। খেয়াল করে বুঝতে পারি, যখনই তিনি তার কলমে কালি ভরতেন তখন প্রথমে 'আল্লাহ্' শব্দটি লিখতেন। আর এভাবে কোনো কোনো পৃষ্ঠা বা ডায়েরিতে কয়েক লাইন জুড়ে শুধু 'আল্লাহ্' শব্দটিই লেখা ছিল।

তিনি জীবনের শেষ বছরগুলোতে নিজ কক্ষে একটি লাইন লিখেছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ্! তি আমো!' তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কী? তিনি উত্তরে বললেন, 'তি আমো' ইতালীয় ভাষার শব্দ যার অর্থ 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এটি লিখেছেন। খোদা তা'লার প্রশংসায় তার রচিত একটি নযমও রয়েছে, যার মাঝে এ পঙক্তি রয়েছে:

"আমি যেন স্থায়ীভাবে তোমার সাক্ষাৎ ও তোমার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করি।"

অসুস্থতার দিনগুলোতে তার একবার অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন হয়েছিল, তখন "আসসালামু আলাইকুম" শব্দ শুনতে পান, এরপর তিনি সুস্থ হয়ে যান। তার ইবাদত ও নামাযসমূহের দর্শনও খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল; এ দুটিকে পৃথক করা যেত না। (তিনি) কয়েকবার তার তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রথমেই খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তন ও (তাঁর সাথে) সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য দোয়া করি। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন তিনি আমাকে বলেন, আমি প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামাযে আমার চাচা অর্থাৎ হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)-র নযমের পঙক্তি পাঠ করি যা চাচা "তুমি" শিরোনামে লিখেছিলেন। এর প্রথম পঙক্তি এরকম:

"হৃদয়ের বেদনার চিকিৎসা তুমি, তুমি আমার প্রেমাস্পদ!
আমি তোমার চাওয়া আর আমার অভিষ্ট তুমি!"

তার পুত্র বর্ণনা করেন, তাহাজ্জুদের নামাযে দোয়া করার পদ্ধতিও বলেছেন যা সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি। খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তন ও দরূদ শরীফ পাঠ করার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর বংশধর এবং তাঁর খলীফাদের জন্য, এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ ও তাঁর বংশধরদের জন্য পৃথকভাবে (দোয়া করতেন)। এরপর নিজ দাদা হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের মাধ্যমে (দোয়া) শুরু করতেন এবং ক্রমান্বয়ে (বংশধরদের) পরবর্তী ধাপে আসতেন। নিজ সন্তানদের মাঝে প্রথমে নিজ কন্যাদের জন্য, এরপর পুত্রদের জন্য (দোয়া করতেন)।

তিনি দোয়াকেই হুকুকুল ইবাদ (তথা বান্দার হক) আদায় করার প্রকৃত মাধ্যম মনে করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা তো ছিলই, কিন্তু তার সবথেকে বেশি ভালোবাসা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তার ছোটো ছোটো কথার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটত। তার পুত্র বর্ণনা করেন, এক-দুইবার এমনটি হয়েছে, তিনি কোনো শক্ত চেয়ারে বসা ছিলেন ও আমি আরেকটি আরামদায়ক চেয়ারে বসে ছিলাম। আমি উঠে যাই ও তার জন্য চেয়ার খালি করে দেই, কিন্তু তিনি সে চেয়ারে বসেন নি। (না বসার কারণ হলো,) মহানবী (সা.) কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে নিজে সে জায়গায় বসতে নিষেধ করেছেন। নিঃসন্দেহে তুমি আমার পুত্র, কিন্তু অন্যের চেয়ার বা বসার স্থান দখল করে নেওয়া– এটি মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের বিপরীত, তাই আমি বসব না। অনুরূপভাবে রাস্তায় যাতায়াতের সময় প্রথমে সালাম দেবার চেষ্টা করতেন। জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পর এবং আসরের নামাযের পর দোয়ার রত

থাকতেন। আর সে–সময় কারো তার সাথে দেখার জন্য আসা তিনি অপছন্দ করতেন। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি হলো দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা তার সন্তানরাও সে–সময় তার নিকট যাওয়া এড়িয়ে চলতাম।

মহানবী (সা.)-এর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে আবশ্যিকভাবে দরূদ শরীফ অধিক হারে পাঠ করার জন্য উপদেশ দিতেন এবং নিজেও অধিকাংশ সময় **'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম; আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ'** পাঠ করতেন।

তিনি বলেন, একবার আমি কাদিয়ান যাই। তখন তিনি আমাকে এই দোয়াটি লিখে দিয়ে বলেন, দারুল মসীহ্র প্রত্যেক কামরায় সর্বপ্রথম আমার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ মীর সাহেবের পক্ষ থেকে) একবার এই দোয়াটি পাঠ করবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবরেও এই দোয়া পাঠ করবে। ১৯৯০ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয় যা মজলিসে শূরার মতামত ব্যক্ত করার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ২৯৮-সি ধারা সংক্রান্ত মামলা ছিল। বিচারক তাকে বলে, আপনি বক্তৃতায় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের অবমাননা করেছেন। তখন তিনি কঠোরভাবে বিচারকের সামনেই বিচারকের কথা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলতেন, (বিচারকের) এ কথায় আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। বিচারক তাকে বলেছিল, মীর মাহমুদ আহমদ বিতর্ক চলাকালে মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীদের সম্পর্কে অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করেছে। তখন মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব বলেন, এটি আমার প্রতি অপবাদ। এটি আগাগোড়া মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! আমি মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর রিসালাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করি। তিনি বলেন, আমি নিজেও সৈয়দ এবং তাঁর বংশের অন্তর্ভুক্ত আর মিথ্যাবাদীর ওপর অভিসম্পাত প্রেরণ করি। এভাবে বিচারকের সামনে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি এই বক্তব্য প্রদান করেন। অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতেও তিনি বিশেষভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন আর এই শব্দটি বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন, আমি মহানবী (সা.)-এর চাকর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। তার ছেলে বলেন, আমার স্মরণ আছে, ১৯৮৯ সালে জামাতের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় দৈনিক আল-ফযল জামা'তের বুযুর্গদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। তিনি শুধু এটিই বলেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন হলো, জীবন্ত খোদার সাথে তিনি পুনরায় মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের বাক্য তিনি বলেছিলেন।

অসুস্থতার কারণে অনেক সময় তিনি কাদিয়ান যেতে পারতেন না, প্রস্তুতি থাকত কিন্তু প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যেত। কাদিয়ানের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, অন্তিম দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবরে উপস্থিত হবার গভীর আগ্রহ ছিল; তাই অনেক সময় কষ্ট সহ্য করে চলে যেতেন।

তার অধ্যয়ন সম্পর্কে লেখা আছে, কুরআন শরীফ, বুখারী এবং রূহানী খাযায়েন পড়া তার দৈনন্দিন রীতি ছিল এবং আমাদেরকেও এগুলো পাঠ করার উপদেশ প্রদান করতেন। যারা সাক্ষাতের জন্য আসত, তাদেরকেও (এগুলো) অধ্যয়নের উপদেশ প্রদান করতেন। ১৯৯০ সালে তার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়, তাতে তিনি চিনিউটের হাজতেও এক রাত কাটিয়েছেন। তার সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, আমাকে বালতি, মগ ও বারাহীনে আহমদীয়া এনে দাও। মিয়া খুরশিদ আহমদ সাহেব তখন সাথে ছিলেন; তিনি

বলেন, এত কষ্টদায়ক হাজতে এত গরমে এরূপ কঠিন বই কীভাবে পড়বেন? তিনি বলেন, আমার জন্য এটি কোনো কঠিন বিষয় নয়, আমি এর পূর্বেও পাঁচবার এটি পড়ে শেষ করেছি। যাহোক, সংকীর্ণ জায়গায় গরমের সময় কষ্টের সাথে তিনি এই দিনটি অতিবাহিত করেছেন। যেহেতু তিনি খুবই পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাই তার জন্য এটি কষ্টদায়ক বিষয় ছিল। কিন্তু তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার চিন্তা ছিল তার মাথায়। ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়াও ইহুদীধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা ছিল এবং এই বিষয়গুলোতে তিনি ব্যাপক দক্ষতা রাখতেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তিনি ব্যাপক দক্ষতা রাখতেন। প্রথাগত ফিকাহ সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ রাখতেন না। সর্বদা এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, পবিত্র কুরআন, সুন্নতে রসূল (সা.), সহীহ হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাদের বাণী থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করো।

জাগতিক জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান অধ্যয়ন, ইতিহাস অধ্যয়ন, একইভাবে বিনোদনের জন্য হাইকিং সংক্রান্ত অনেক পুস্তক তিনি পাঠ করতেন। ইংরেজ ও উর্দু কবিদের কাব্যও পড়েছেন এবং অনেক কবির পঙক্তিও মুখস্থ ছিল। তার আইপ্যাডে কবিদের কবিতাও শুনতেন। ভাষা রপ্ত করার যোগ্যতা ছিল। উর্দু, আরবী ও ইংরেজী ছাড়াও স্প্যানিশ, ইতালীয় ও হিব্রু ভাষাতেও বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইতালীয় ভাষার অনুষ্ঠান টিভি ও আইপ্যাডে নিয়মিত দেখতেন। এর কারণ হলো, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কোনো এক সময় তাকে ইতালীয় ভাষা শিখতে বলেছিলেন এবং এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, হুযূর (রা.) তাকে ইতালি পাঠাবেন। তিনি বলতেন, হুযূর বলেছিলেন, ভাষা শেখো, তাই আমি ভাষা শিখছি। এই নির্দেশ তো রহিত করা হয় নি! তাই এখনো এই নির্দেশ আমার জন্য বলবৎ আছে, এজন্য আমি তা অব্যাহত রাখব। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর্থিক কুরবানী করতেন। তদ্রুপ উত্তরাধিকারসূত্রে যতটুকুই সম্পদ পেয়েছেন তৎক্ষণাৎ এর হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করেছেন।

(রাবওয়া) জামেয়ার বর্তমান প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব লেখেন, মীর সাহেব অত্যন্ত নিষ্পাপ ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। অত্যন্ত পরিশীলিত অথচ বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। স্বল্পেতুষ্টি ও তাওয়াক্কুল 'আলাল্লাহ্‌র (তথা আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থার) এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত ছিলেন। জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র ছিলেন। অনেক বড়ো আলেম ছিলেন। [এসব বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে সঠিক।] মুফাসসেরও ছিলেন, মুহাদ্দেসও ছিলেন। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সৌভাগ্যবান আলেম যিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার পাশাপাশি পুরো সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র উর্দু অনুবাদ করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মীর সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল– কাজ, কাজ আর শুধুই কাজ। মীর সাহেবের অভিধানে ছুটি নামক কোনো শব্দ ছিল না। মীর সাহেব খিলাফতকে দর্শনের দর্পণ ছিলেন, যিনি আমাদেরকে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। নিজ কর্ম দ্বারা দেখিয়েছেন, খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এভাবে করতে হয়। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাইকেলে করে যথাসময়ে যেতেন। সকাল ৭:২০ মিনিটে জামেয়া শুরু হতো, ৭:২০ মিনিটেই পৌঁছে যেতেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২-৩ বার সাইকেল থেকেও পড়ে গিয়েছেন। তাকে আমি বলেছিলাম, আপনি ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, (অর্থাৎ) আপনি জামেয়ায় ১০টার সময় যান। আর একথাকেও তিনি নির্দেশ মনে করে ১০টার সময়ই দপ্তরে যেতেন। বরং মুবাশ্বের সাহেব এটিও লিখেছেন, একদিন ১০টার পূর্বে এসে বাইরে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমি কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা

করি। এরপর আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি বাইরে কেন পায়চারি করছেন? ভেতরে কেন আসছেন না? তিনি উত্তরে বলেন, এখনো ১০টা বাজে নি। আর যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আমি যেন ১০টায় দপ্তরে যাই। এজন্য আমি ১০টায় দপ্তরে যাব। এটি তার একটি দৃষ্টান্তমূলক আনুগত্য ছিল। তিনি মানুষের জন্য একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কর্মকর্তাদের জন্যও এবং অধীনস্তদের জন্যও।

কাদিয়ানের মুরব্বী তানভীর নাসের সাহেব বলেন, তার একটি বিষয় যা আমার হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে তা হলো, একদিন কাদিয়ানের মসজিদে মুবারকে বসা ছিলাম; মীর সাহেব মসজিদের প্রথম সারিতে পায়চারি করছিলেন। আমার কাছে তার এই পায়চারি করা ও দোয়া করতে দেখা খুব ভালো অনুভূত হচ্ছিল এবং আমি খুব উপভোগ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার মধ্যে যখন সাহস সঞ্চার হয় তখন আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে নিবেদন করি, আপনি মসজিদের প্রথম সারিতে পায়চারি করছেন, এর কারণ কী? তিনি উত্তরে বলেন, আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে এই জায়গায় পায়চারি করতে দেখেছি, আর আমিও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে পায়চারি করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র প্রতি এক অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল।

ফিরোয আলম সাহেব লেখেন, আমি জামেয়ায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে থাকা অবস্থায় মীর সাহেব জামেয়ার প্রিন্সিপাল হয়ে আসেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। শিক্ষাদানের চেয়ে তিনি অধিক ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে, আলেম বা-আমল হয়ে আমাদের তরবিয়ত করেন। আমি তার দরস প্রভৃতি সাধ্যানুযায়ী শুনতাম ও তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতাম। তিনি আমাদেরকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়িয়েছেন। অধিকাংশ সময় তিনি আমাদেরকে সেসব দলিল-প্রমাণ লেখাতেন ও বোঝাতেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজ প্রবন্ধগুলোতে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, একবার তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযার বিষয়ে আমাদেরকে পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে বলেন, বর্তমানেও কি মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে থাকে? তারপর তিনি নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে গিয়ে বলেন, একবার জলসার সময় কোথাও তার ডিউটির সময় এমন হয় যে, খুব অল্প খাবার অবশিষ্ট ছিল। ইতোমধ্যে বেশ কিছু অতিথি এসে যান। সামান্য যেটুকু খাবার ছিল সেটাই বণ্টন করা আরম্ভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা বরকত দিতে থাকেন; সবাই খায় এবং কোনো স্বল্পতা অনুভূত হয় নি।

তার পৌত্র স্নেহের হাশের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভীষণ ভালোবাসা ছিল। তিনি ছোটো-বড়ো সবার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কন করে গেছেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন, (পাঁচবেলার) নামাযেও নিয়মিত ছিলেন। ইনিও যেহেতু মুরব্বী হয়েছেন, তাই তারও নিজের দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করা উচিত। কুরআন করীমের প্রতি এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে, এমন ভালোবাসা কখনো দেখি নি। ফজরের পরে দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলেন, আমি তিফল থাকাকালীন তার বাসায় কিছুদিন থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পর ফজরের নামাযের জন্য আমাকে ওঠাতেন, এরপর দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন। ভীষণ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে পাঠ করতেন যা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তিনি বলেন, আমি যখন জামেয়ায় ভর্তি হই; [তিনি কানাডার জামেয়ায় ভর্তি হন;] যখনই সেখানে যেতাম তিনি জিজ্ঞেস করতেন, কুরআন করীমের অনুবাদ ও তফসীর পৃথকভাবে পড়ায় নাকি একসাথে? আমি তাকে বলি, পৃথক পৃথক। এতে তিনি খুশি হয়ে

বলেন, এমনটাই হওয়া উচিত, কেননা মানুষ তফসীর করতে পারে ঠিকই কিন্তু অনুবাদ পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার কথা এভাবে উল্লেখ করেন: তিনি রূহানী খাযায়েনের পাগল ছিলেন। আমাকে কয়েক বার এটি বলেছেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিতাব অনেক বার পড়েছি, কিন্তু প্রতি বারই নতুন বিষয় উন্মোচিত হতে থাকে। আমাকে বলতেন, রূহানী খাযায়েন পড়লে তুমি কুরআন, হাদীস, সীরাত সবকিছু বুঝতে পারবে। একথা তিনি আমাকেও একবার বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল বই তিন বার অবশ্যই পড়েছি এবং কোনো কোনো বই তো তিন বারের বেশিও পড়েছি। এ সত্ত্বেও তিনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ছিলেন, কখনো জ্ঞান জাহির করতেন না।

তিনি বলেন, তিনি একবার বাড়িতে বসে খুতবা শুনছিলেন, ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ চলে যায়। পাকিস্তানের রাবওয়াতে প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে যায়। টিভি বন্ধ হয়ে যায়। আমি তখন ছোটো ছিলাম, আমি উঠে চলে যেতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, বসো! এটি নিশ্চিত নয় যে, কখন বিদ্যুৎ চলে আসে এবং যুগ-খলীফার খুতবা পুনরায় আরম্ভ হয়ে যায়; তুমি এতগুলো শব্দ হাতছাড়া করবে? এটি তার কাছে অসহনীয় ছিল। তিনি বলেন, বসো এবং দোয়া করতে থাকো, যাবার অনুমতি নেই। এর মাঝেও অনেক কল্যাণ নিহিত।

একবার কোনো একটি অনুষ্ঠান ছিল যেখানে আমার বক্তৃতা ছিল। তিনি সংবাদ পান নি এবং শুনতেও পারেন নি। এমটিএ চালু করলে দেখেন, ততক্ষণে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনো একজন খাদেমকে বলেন। আইপ্যাডে তা চালু করার চেষ্টা করলে দেখা যায়, সেখানে অন্য ভাষায় তা হচ্ছে, কিন্তু তিনি সেটিই শুনতে থাকেন। এরপর আমি যখন আসি তখন আমি সেটি উর্দুতে লাগিয়ে দেই, যার ফলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ আর আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ! তিনি ছোটোদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স-এর সম্পাদক আমের সাফীর সাহেব বলেন, আমিও তার মাঝে খিলাফতের প্রতি অদ্ভুত, বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছি। তিনি বলেন, আমি এই বিভাগের দায়িত্ব পেলে তিনি এসে আমাকে বলেন, [বরং আমি নিজেই তাকে অর্থাৎ আমের সাফীর সাহেবকে বলি,] আপনি আলেমদের বলুন, তারা যেন রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের জন্য প্রবন্ধ লেখে। আর আমি কিছু আলেমের নামও বলেছিলাম যাদের মাঝে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের নামও উল্লেখ করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি তখন পাকিস্তানে। তার তখন ঘুমেই থাকার কথা, কারণ রাত প্রায় দশটা-এগারোটা বাজে তখন। তবে তারা আত্মীয়স্বজনরা বলেন, না, তা নয়। তিনি বলেন, আমি ফোন করলে তার স্ত্রী ফোন ধরেন। আমি তাকে বলি, আমাকে এবিষয়ে কথা বলতে হবে। তিনি বলেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু এরই মধ্যে মীর সাহেবের চোখ খুলে যায়। ফোন কলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে অথবা কথাবার্তার আওয়াজে তিনি জাগ্রত হন। তারপর তিনি কথা বলেন। আমি তাকে বলি, খলীফাতুল মসীহ্ বলেছেন, আপনি অমুক বিষয়ের ওপর রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখুন। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমি সকালে জানাচ্ছি। পরদিন মীর সাহেব ১৫ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লিখে আমাকে (অর্থাৎ হুযূরকে) পাঠান। আমি সেটি আমের সাফীরকে পাঠিয়ে দিয়ে বলি, এটি তার (তথা মীর সাহেবের) পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। মীর সাহেব আমাকে লিখেছিলেন, রাতের বেলা একটি ছেলে ফোন করে আমাকে বলেছিল, খলীফাতুল মসীহ্ আমাকে এই প্রবন্ধ লেখার

নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি এই প্রবন্ধ লিখলাম। ১৫ পৃষ্ঠার প্রথম কিস্তি প্রেরণ করছি এবং পরবর্তীতে আরো পাঠাতে থাকব। এটি ছিল তার আনুগত্যের মান। সময়ের ক্ষেত্রে আনুগত্যের বিষয়ে পূর্বেই আমি উল্লেখ করে দিয়েছি; দশটা না বাজলে তিনি অফিসে প্রবেশ করতেন না, দশটা বাজলেই প্রবেশ করতেন।

প্রতি বছর জলসার সময় কাফনে মসীহ্ সম্পর্কিত তার যেই অনুষ্ঠান হতো এবং এ সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে অংশ নিতেন এবং সবকিছু হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকে বর্ণনা করতেন। আমের সাফীর লেখেন, মীর সাহেব বলতেন, মুরব্বীরা যখন কোনো জ্ঞানগত বিষয়ে অধ্যয়ন করেন তখন তারা মূল বিষয় অর্থাৎ জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে জাগতিক রেফারেন্সের দিকে বেশি মনোযোগ দেন। কিন্তু তার রীতি ছিল, তিনি প্রথমে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বুঝতেন এবং পরবর্তীতে জামা'তের বাইরের অথবা জাগতিক দৃষ্টিকোণগুলো দেখতেন, এর বিপরীতটি নয়। তিনি বলেন, মীর সাহেব অত্যন্ত দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বের নামকরা কাফন বিশেষজ্ঞদের সামনে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশ্বাস উপস্থাপন করতেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ থেকে বেঁচে যাবার ঘটনা উপস্থাপন করতেন। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স টিম দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করে আসছিল। তাদের চেষ্টা ছিল, শ্রাউড (তথা কাফনের কাপড়) বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরে জামা'তের অবস্থানকে মজবুত করা। কিন্তু এর বিপরীতে এ বিষয়ে মীর সাহেবের কৌশল ছিল ভিন্ন। তার মতে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মারহামে ঈসা (বা ঈসায়ী মলম) বিষয়ে জোর দিয়েছেন। একারণে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যসমূহকে মূল ভিত্তি বানিয়ে অন্যান্য দিকগুলোকে শাখার মর্যাদা দেওয়া উচিত। তিনি বার বার এই মত উপস্থাপন করতেন, মারহামে ঈসা হচ্ছে ক্রুশের ঘটনাকে বুঝার চাবিকাঠি। রিভিউ টিমের প্রচেষ্টায় যদিও জামা'তের নৈতিক ভাবমূর্তি শক্তিশালী হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানগত পর্যায়ে কোনো কার্যকরী প্রভাব ফেলতে পারে নি। তিনি বলেন, কিন্তু মীর সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত নিজ প্রভাব দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রাউড (বা কাফনের কাপড়) বিষয়ক সেই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও আলোকচিত্রী ব্যারি শোয়ার্টয নিজেই স্বীকার করেছেন, যদি আপনারা সত্যিই মারহামে ঈসা সংক্রান্ত আপনাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমাকে স্বীকার করতে হবে, ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। তার বহু ঘটনা রয়েছে যা অন্যান্যরাও লিখেছেন; তার সন্তানরা, তার বংশধররা, জামা'তের সদস্যরা, ওয়াকেফীন এবং মুবাল্লিগরাও লিখেছেন যা বর্ণনা করা কঠিন। একটি বিষয় যা সকল মুরব্বী না লিখলেও অনেকেই লিখেছেন, তা হচ্ছে– তিনি বলতেন, একটি শব্দ হৃদয়ে গেঁথে নাও। তা হলো قبر; এর ওপর আমল করো। এই قبر শব্দের অর্থ তিনি বলেছেন, ق হলো কুরআন, ب হচ্ছে বুখারী তথা হাদীসের পুস্তক এবং ر হচ্ছে রূহানী খাযায়েন। তিনি প্রায়ই বলতেন, তোমরা যদি এগুলোর পাণ্ডিত্য অর্জন করো ও এগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করো, জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করো আর এগুলো হতে আধ্যাত্মিকতা অর্জনের চেষ্টা করো, তাহলে তোমরা তোমাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে।

এমনিতেও 'কবর' এমন একটি শব্দ যেটিকে মানুষ সর্বদা স্মরণে রাখলে আল্লাহ্ তা'লাও স্মরণে থাকেন। আর খোদা তা'লা স্মরণে থাকলে মানুষ তাকওয়ার পথে চলারও

চেষ্টা করে। যাহোক, তিনি খিলাফতের একজন মহান সাহায্যকারী ছিলেন, নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, প্রতিটি বিষয় অক্ষরে অক্ষরে পালনকারী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। এমন 'সুলতানে নাসীর' অর্থাৎ শক্তিশালী সাহায্যকারী ছিলেন যারা বিরল হয়ে থাকেন। এমন একজন আলেম ছিলেন যার কথা ও কাজ ছিল এক-অভিন্ন। বর্তমানে আমি অন্ততপক্ষে তার মতো কাউকে দেখি না। আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডারে তো কোনো ঘাটতি নেই, তাই আল্লাহ্ করুন, এমন আদর্শ ব্যক্তিত্ব যেন আরো অনেক সৃষ্টি হয় আর আহমদীয়া খিলাফতকে এরকম বিশ্বস্ত, নিষ্ঠাবান ও তাকওয়াপরায়ণ সাহায্যকারী আল্লাহ্ তা'লা দান করতে থাকুন। আর তার সন্তানদেরকেও তাদের পিতার দোয়ার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন এবং তার আদর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী চলার তৌফিক তাদেরকে দান করুন।

যেমনটি আমি বলেছি, দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো গোলাম রসূল সাহেবের পুত্র করাচিনিবাসী ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেবের যিনি কিছুদিন পূর্বে (আল্লাহ্‌র খাতিরে) কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল সত্তর বছর। বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী করাচির মালির কলোনি হালকার প্রেসিডেন্ট মরহুম তাহের মাহমুদ সাহেবকে (জামা'তের) দুইজন সদস্য যথাক্রমে ইজায হোসেন সাহেব এবং আইয়ায হোসেন সাহেবের সাথে করাচির মালির কলোনিতে নিজেদের মসজিদের অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেখানে জুমুআর নামায পড়ার অভিযোগে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে আর গ্রেফতার করে। আগাম জামিন নেওয়া হলেও পরবর্তীতে তার জামিন বাতিল করা হয় আর তাকে গ্রেফতার করা হয়। জামিনের জন্য যখন আদালতে ছিলেন তখন বিরুদ্ধবাদী লোকজন এবং বিরুদ্ধপক্ষের উকিলরা তার ওপর আক্রমণ করে আর তাকে সংহিসতার লক্ষ্যে পরিণত করে এবং ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেয়। এমনকি পুলিশের একজন কর্মকর্তা সেই লোকদের বলে, তাকে গুলি করো! আর থানায়ও তার ওপর অনেক নির্যাতন করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি করতে জোরাজুরি করা হয়, কিন্তু তিনি দৃঢ় ছিলেন এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। এরপর তাকে বিচারিক প্রক্রিয়ায় জেলে স্থানান্তর করা হয়। জেলে তিনি দুই মাস ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তার কিডনিতে ইনফেকশন হবার কারণে জেলেই তার শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটলে পরে তাকে সেখান থেকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুর সময়ে হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেও তার হাতে হাতকড়া লাগানো ছিল। তার মৃত্যু নির্যাতনের কারণেও হতে পারে, কেননা এর কারণে হয়ত শরীরের ভেতরে আঘাত পেয়ে থাকবেন। এদিক থেকে তিনি বন্দিজীবনের কঠোরতা সহ্য করেছেন এবং আদালতের সামনে তিনি মার খেয়েছেন। এগুলো এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ যেগুলোর নিরিখে তিনি শাহাদতের মর্যাদাই প্রাপ্য এবং শহীদদের দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবেন। তিনি একজন ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ও দাওয়াতে ইলাল্লাহ্'র সেক্রেটারি হিসেবে এবং জামা'তী বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনেরও দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বড়ো চাচা হাকীম আহমদ দীন সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী ইমাম দীন সাহেবের মাধ্যমে ১৯২০-এর দশকে দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াতের ভুবনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার পিতাও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রদের পরিচয় গোপন রেখে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। অনেক দরিদ্র যুবক-যুবতীর বিয়ের ব্যয়ভার বহন করেছেন। জেলের

ভেতরেও কয়েদি সঙ্গীদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তার কারাগারে থাকাকালে সাক্ষাতের সময় কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলতেন, অসুবিধার কী আছে! আমি তো এখানে ধর্মের কারণে এসেছি। আমি তো এখানে তবলীগ করার সুযোগ পাচ্ছি। সেই সময়েও (কারাগারে তিনি) নির্ভীকভাবে ও সাহসিকতার সাথে তবলীগ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৭ জানুয়ারি করাচির মালির কলোনি থানায় তাহের মাহমুদ সাহেবের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এক বাদী অভিযোগ করেছিল, ইনি আমার ছোটো ভাইকে বয়আত করিয়েছিলেন। সেই সময়েও তিনি বন্দি ছিলেন। এটি তার দ্বিতীয় বারের মতো কারাবরণের সৌভাগ্য ছিল। তিনি আরো অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তার ওপর তিন বার আক্রমণও হয়েছে, কিন্তু নিজের বিষয়টি তিনি খোদার দরবারে ন্যস্ত করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, (তার ওপর) আক্রমণকারীদের একজনকে খোদা তা'লা পাকড়াও করেছেন। এরপর সেই শত্রু ব্যক্তিগত কোনো লড়াই-ঝগড়ায় নিহত হয়, যার ফলশ্রুতিতে অপর দুইজন (শত্রু) তার বাড়িতে গিয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি তাদেরকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দেন; কোনো মামলা দায়ের করেন নি।

মরহুমের স্ত্রী বলেন, আমার সাথে তার আচার-আচরণ ছিল আদর্শস্থানীয়। তিনি জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। (তিনি) রাতে (দেরিতে) বাড়ি ফেরার পরও আমি কখনো তার কাছে কোনো অভিযোগ করতাম না বা বাধা দিতাম না। কেননা আমার আত্মিক প্রশান্তি ছিল, (আমার) মৃত স্বামীর এই কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে আমাদের (সকল) কাজ করে দিচ্ছেন। তার সন্তানদের মাঝ থেকে যিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী মুরব্বী সিলসিলা– তিনি লেখেন, ১৯৮০-র দশকে (আমার পিতার) আল্লাহ্র পথে কারাবরণের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ তার ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিল। কেউ সেই নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে সাবধানতা অবলম্বন করতে বললে তিনি অত্যন্ত আবেগআপ্লুত হয়ে বলতেন, পুলিশের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাই আমার আর কোনো ভয়ভীতি নেই। এখন তো আমি নির্ভয়ে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র কাজ করি।

তার অবর্তমানে তিনি তার স্ত্রী মোহতরমা মুবাশ্বেরা সাহেবা ছাড়াও একজন কন্যা ও তিনজন পুত্রসন্তান রেখে গেছেন। (তার) পুত্র মুনীব মাহমুদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, যিনি পাকিস্তানেই কর্মরত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন। (জুমুআর) নামাযের পর (গায়েবানা) জানাযা হবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)